গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা | ২৫ - ৩১ আগস্ট ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত-নিপীড়িত জনগণের চোখের জলই সত্যানুসন্ধানী শিবদাস ঘোষকে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে

ব্রিগেড সমাবেশে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণটি সংক্ষেপিত আকারে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। পূর্ণাঙ্গ ভাষণ আমরা গণদাবীর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করব।

আজকের এই সমাবেশে কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক মহিলা, বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যবিত্তরা এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির প্রতিনিধি যাঁরা এসেছেন, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাঁদের স্বাগত জানাই। বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের কর্মীরা যখন অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, যে সমস্ত জনগণ অত্যন্ত সানন্দে, উদারভাবে তাদের সাহায্য করেছেন, আমাদের বন্ধুবান্ধব যাঁরা সাহায্য করেছেন— তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের সাহায্যে এই ফান্ড সংগ্রহ করতে না পারলে আজকের ঐতিহাসিক কর্মসূচি আমরা সম্পন্ন করতে পারতাম না। আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। আপনারা জানেন, আমরা সব সময়েই সাধারণ মানুষের চাঁদার উপরেই নির্ভর করি। এই সমাবেশে জমায়েত মানুষের অধিকাংশ বাংলাভাষী। তাই আমার বক্তব্য বাংলায় রাখব। অন্য রাজ্যের ভিন্নভাষীরা এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামের দিনগুলি

এখন আমি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের কয়েকটি লাইন আপনাদের পড়ে শোনাব। "প্রথম যখন এই দল শুরু হয়, কী ছিল আমাদের? কিছুই ছিল না। টাকা নেই, পয়সা নেই, লোকজন নেই, থাকার জায়গা নেই, কেউ চেনে না, জানে না। ... আমি তখন অল্প বয়সের যুবক, সেই আমি বলছি, ভারতবর্ষে সত্যিকারের কোনও বিপ্লবী দল নেই, দল গঠন করতে হবে। অনেকেই যুক্তি শুনে বলেছে, এটা তো করা উচিত। যুক্তিগুলি তো ভালই, কিন্তু এ একটা পাগলের মতো কথা। এ অসম্ভব ব্যাপার। এ হতে পারে না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেশি তর্ক করিনি। আমি তাদের পাল্টা উত্তর করেছি, হ্যাঁ, হবে না মেনে নিলাম। তা হলে কী করতে হবে বলুন। গোলামি করব? দালালি করতে হবে? বিবেক বিক্রি করতে হবে? আমি পারব না। এই লড়াই করতে গিয়ে যদি খেতে না পেয়ে রাস্তায় আমি মারাও যাই, আমি মাথা উঁচু করে মরব— আমাকে গুলি করে মারা যাবে, কিন্তু আমাকে কেনা যাবে না।

এমনকি মাথা গোঁজার মতো ঘরও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, যখন না খেয়ে দিনের পর দিন একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের একটি নতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, এ নিয়ে সে দিন কিন্তু আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না।

সিপিআই তখন সম্মিলিত একটা পার্টি। আমাদের দেখিয়ে বিদ্রুপ করেছে, বলেছে, ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, বলেছে, চামচিকাও পাখি আর এসইউসিআইও পার্টি—এদের সঙ্গেও বসতে হবে! এ সবই আমি চুপ করে সহ্য করেছি। তাদের কোনও বিদ্রুপই গায়ে মাখিনি। শুধু দলটা গড়ে তোলার জন্য একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়েছি। আমরা কত বছর মাদুরে শুয়েছি, কত শীত-গ্রীষ্ম আমাদের এ ভাবে কেটেছে। ... আমরা কত দিন খাইনি, তা নিয়ে আমরা কারও কাছে কিছু বলতেও লজ্জাবোধ করতাম। কারণ মনে হত, খাবার জোগাড় করতে পারিনি, সমর্থক নেই, পাঁচটা পয়সা চাঁদা তুলতে পারিনি, লোকে দেয়নি, এটা আমাদেরই অক্ষমতা। এটার মধ্যে আবার গর্ব করে বলার কী আছে। ত্যাগের কী মাহাত্ম্য আছে! ... বিপ্লবীদের অভাব, অনটন, হাজার দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন যা দেখে সাধারণ মানুষ তাদের জন্য দুঃখ করে, সেই আপাতদৃষ্ট দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে একজন বিপ্লবী যে শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি, গাড়ি, আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পায় না। **বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের থেকে বড় জীবন তার আর কিছুই নেই। ... আমি জানি, আমাকে হয়তো না খেয়ে মরতে হবে। একটা লোক না খেয়ে মরছে কি না তার খবরটাও কেউ নিতে আসবে না। ... কিন্তু কোনও কিছুই বিফলে যায় না, সকল বিপ্লবীই জানে ঐ যে সে না খেয়ে নিঃশেষে মরে গেল, দশটা লোকের মধ্যে, পঞ্চাশ-একশোটা লোকের মধ্যে শুধু বলে গেল যে যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ ও দল ছাড়া কিছু হবে না, এটা ব্যর্থ হয় না, ব্যর্থ হতে পারে না।**"

তিনি বলেছিলেন, এই সংগ্রাম ব্যর্থ হতে পারে না। এই সংগ্রাম যে ব্যর্থ হয়নি এই বিশাল সমাবেশই তা দেখিয়ে দিচ্ছে। সারা দেশে আমাদের সংগঠনের একটা ছোট অংশ নিয়ে আজকের এই জমায়েত। দেশের ২৬টি রাজ্য থেকে কর্মী এবং সমর্থকরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রে সম্মিলিত করার মতো উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করার আর্থিক ক্ষমতা আমাদের নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষ আজও বেঁচে আছেন আমাদের বুকের মধ্যে। তাঁর দেখানো পথেই এই পার্টি চলছে, এই পার্টি এগিয়ে চলেছে। গোটা ভারতবর্ষে এই পার্টি বিস্তার লাভ করছে কোনও এমএলএ, এমপি-র জোরে নয়, কোনও সরকারের জোরে নয়, কোনও মিডিয়ার পাবলিসিটির জোরেও নয়, একমাত্র মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, আর তাকে আরও বিকশিত, উন্নত করেছেন যিনি, সেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার শক্তির জোরে।

একটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে ছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি যখন

ব্রিগেডে ঃ মঞ্চে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ। ৫ আগস্ট

দুয়ের পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদকে ভারতের মাটিতে বিশেষীকৃত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

একের পাতার পর

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদের আহ্বানে কৈশোরেই ঘর ছাড়ছিলেন, গরিব নিম্নবিত্ত পরিবারের বাবা-মা বলছেন, আমাদের কে দেখবে? তাঁদের একটি কথাই তিনি বলেছিলেন— লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বাবা-মা পথে ঘাটে কাঁদছে। আমি সকলের সন্তান। সকলের চোখের জল মোছানো আমার কাজ। পরবর্তীকালে তাঁর একটা ঐতিহাসিক উক্তি— 'বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি', যেটা সমস্ত যুগের সমস্ত বড় মানুষের অব্যক্ত কথা, তাঁর মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। সব যুগে, বুদ্ধ থেকে যিশু, মহম্মদ, নবজাগরণের মনীষীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধারা এবং সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের যোদ্ধারা সকলের মনের অব্যক্ত কথা হচ্ছে এটাই। এটা আমাদেরও তিনি শিখিয়ে গেছেন।

ব্রিগেডে ঃ *বহু বাধা ঠেলে, বহু পথ পেরিয়ে ...*

কেন তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করেন

সেই সময়ে তিনি শুধু ব্রিটিশ শাসনের অবসানই চাননি, তিনি চেয়েছিলেন গরিব মানুষের শোষণমুক্তিও। কিন্তু কী ভাবে সেটা সম্ভব, সেই পথ খুঁজছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। জনগণের মুক্তির জন্য সঠিক পথ কোথায়? ধর্মীয় পথে সে মুক্তি সম্ভব কি? তিনি বিচার করে দেখলেন, সে পথে সম্ভব নয়। ধর্মীয় চিন্তার শেষ কথা হচ্ছে— এই দুনিয়াকে চালায় সর্বশক্তিমান ভগবান, আল্লা, গড। ধনী-গরিব তারই সৃষ্টি। ভালমন্দ যা কিছু ঘটছে সবই বিশ্বপিতার ইচ্ছা, তার ইচ্ছাতেই কর্ম। গরিবরা পূর্বজন্মের পাপজনিত কর্মফল ভোগ করছে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কোরান, বাইবেল, বেদ-বেদান্ত, কোথাও এই প্রশ্নের উত্তর নেই যে বেকারদের চাকরি কী ভাবে হবে, ছাঁটাই কী করে আটকানো যাবে, মূল্যবৃদ্ধি কী করে রুখবে, শিক্ষার সুযোগ, চিকিৎসার সুযোগ, বাঁচার সুযোগ, নারীর মর্যাদা কী ভাবে রক্ষা পাবে।

বড় মানুষদের বক্তব্য থেকেও কি পথের সন্ধান মিলবে? সেখানেও দেখছেন মতপার্থক্য। একজন বড় মানুষ বিদ্যাসাগর। তিনি বলেছেন, বেদ-বেদান্তে, ধর্মীয় শাস্ত্রে সত্য নেই। এগুলি সব ভুল। আমাদের জানতে হবে ইউরোপের বিজ্ঞান, ইউরোপের বস্তুবাদ। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানতেন না। আবার আরেকজন বড় মানুষ বিবেকানন্দ, বেদান্তের জয়গান করে গেলেন। সেই বিবেকানন্দও বলতেন, বিদ্যাসাগর খুবই বড় মানুষ। তা হলে কার কথা মানবেন? বিদ্যাসাগর না বিবেকানন্দ?

কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝলেন, এর উত্তর একমাত্র দিতে পারে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা। বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত। জল কী— বিশ্বের সর্বত্র বিজ্ঞানের উত্তর একটাই। ইলেকট্রিসিটি কী— উত্তর একটাই। এগুলি পরীক্ষিত, প্রমাণিত। এই বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে যে ঐতিহাসিক দর্শন মার্ক্সবাদ এসেছে, তা হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। এই মার্ক্সবাদকে ভিত্তি করেই একমাত্র সঠিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান দেখিয়েছে বস্তুগজগৎ নিরন্তর পরিবর্তনশীল, গতিশীল। এই পরিবর্তনের, এই গতির নিয়ম আছে। প্রত্যেকটি বিশেষ বস্তুর বিশেষ নিয়ম আছে। **বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন নিয়ম আছে। এই নিয়মকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জানা যায়। তার ভিত্তিতে ক্রিয়া করা যায়। বস্তুর মতো এই নিয়মকেও সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করা যায় না। বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন নিয়মকে কো-অর্ডিনেট করে, কো-রিলেট করে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে আবিষ্কার হয়েছে মার্ক্সবাদী দর্শন। ফলে মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন, যার ভিত্তিতে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত, নিরন্তর পরিবর্তনশীল বিশ্বের সব কিছুকে স্টাডি করা যায়। একমাত্র তার ভিত্তিতেই যে সত্য পাওয়া যাবে সেই সত্যের ভিত্তিতে সমস্ত মানুষকে পথ দেখানো সম্ভব। এই মার্ক্সবাদকে হাতিয়ার করেই তিনি এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিচার করলেন।** তিনি দেখলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে এত শহিদের এত আত্মদান, অথচ নেতৃত্বে পুঁজিপতি টাটা-বিড়লাদের ব্যাকিংয়ে গান্ধীবাদী কংগ্রেস। আর একটা ধারার নেতৃত্বে আছে মধ্যবিত্ত সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনগুলি— অনুশীলন, যুগান্তর, হিন্দুস্তান রিপাবলিকান পার্টি, গদর পার্টি। এ রকম অনেক বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী।

সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দেয়নি সিপিআই

সেই সময়ে ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা দুই ভাগে বিভক্ত। বৃহৎ বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করছে। ওদের প্রধান লক্ষ্য মুনাফা। ওরা শ্রমিকবিপ্লবকে ভয় পায়। ভারতবর্ষে যারা কমিউনিস্ট, তাদের কর্তব্য হচ্ছে, মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সংগঠিত করা এবং এই বুর্জোয়া নেতৃত্বকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখলেন, কমিউনিস্ট বলে পরিচিত সিপিআইয়ের ভূমিকা স্ট্যালিনের এই আবেদনের সম্পূর্ণ বিরোধী, মার্ক্সবাদবিরোধী। এক সময়ে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা একত্রিত হয়ে আপসমুখী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিল। এই সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে বলেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের বন্ধু, যার ভয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কাঁপে। বলেছিলেন, স্বদেশি আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষককে আনতে হবে, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই। বলেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা চাই— যা এর আগে কেউ বলেনি। এর ফলে বুর্জোয়ারা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, গান্ধীবাদীরা ভয় পেয়ে গেল। তারা পরের বার সুভাষচন্দ্রকে পরাস্ত করার জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দাঁড় করাল পট্টভি সীতারামাইয়াকে। তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র জিতলেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে। কিন্তু জেতার পরে বুর্জোয়ারা গান্ধীজির নেতৃত্বে একটা ষড়যন্ত্র করল। ত্রিপুরী অধিবেশনে প্রস্তাব আনল যে কংগ্রেসে গান্ধীজির মত নিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত করতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করতে হবে গান্ধীজির অনুমোদন নিয়ে। এই প্রস্তাবে সিপিআই, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গান্ধীবাদীদের সমর্থন করল। সুভাষচন্দ্র পরাস্ত হলেন। এর পরে কংগ্রেস নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রকে কাজ করতে দিচ্ছিল না। ফলে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১৯৩৯ সালের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সাসপেন্ড করল। অর্থাৎ কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন করে দিল। আজকের দিনে অনেকেই এইসব ইতিহাস জানেন না।

তারপর সুভাষচন্দ্র রামগড়ে ১৯৪০ সালে পাল্টা অধিবেশনে 'লেফট কনসোলিডেশন' ফ্রন্ট গড়ার ডাক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে বলেছিলেন, 'তোমরা এসো, আমরা বামপন্থীরা একত্রিত হই। এর দ্বারা মার্ক্সবাদী পার্টি গঠনের জমিও প্রস্তুত হবে।' কিন্তু ওরা যায়নি। সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, 'কমিউনিজমের মতো এত বড় সর্বজনীন মানবতাবাদী আদর্শ ভারতবর্ষে জায়গা করতে পারল না, কারণ এ দেশে কমিউনিস্ট বলে যাদের ভাবা হয় তাদের কৌশল-কর্মপদ্ধতি এমন যে বন্ধুকে তারা শত্রুশিবিরে ঠেলে দেয়। তারা আপন করতে জানে না।' তারা সুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব গড়ার সুযোগকে কাজে লাগালো না এবং বাস্তবে বুর্জোয়া নেতৃত্বকেই কায়েম হতে সাহায্য করল। শ্রমিক-কৃষককেও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করার জন্য সংগঠিত করল না। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে গোটা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলে উঠেছিল, ইংরেজরা ভয়ে কাঁপছিল, গান্ধীবাদীরা ভয়ে কাঁপছিল। সেই আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করল সিপিআই। অনেকে ভেবেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা করতে বলেছে তাদের। ১৯৫২ সালে স্ট্যালিন তাদের সমালোচনা করে বললেন, '৪২ সালে তোমরা ইংরেজের সাথে কেন হাত মিলিয়েছিলে। সিপিআই-এর ভূমিকা হচ্ছে এই। সুভাষচন্দ্র কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ট্যাকটিক্স হিসাবে জাপানের সাহায্য নিয়ে আইএনএ বাহিনী গঠন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মতো দেশপ্রেমিক কি জাপানের দালাল ছিলেন? ভারতবর্ষে জাপানের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন? তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে জাপানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি আইএনএ বাহিনীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে

ব্রিগেডে ঃ *শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকলেই*

ব্যবহারও করতে দেননি। অথচ সিপিআই সুভাষচন্দ্রকে বলল, জাপানের দালাল।

সিপিআইয়ের গোড়ায় গলদ, তাই গড়তে হল সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি

যখন দেশ ভাগের প্রশ্ন উঠল, হিন্দু মহাসভা দেশ ভাগ চাইল, মুসলিম লিগ চাইল, সিপিআইও দেশ ভাগকে সমর্থন করল। বলল— হিন্দু আলাদা জাতি, মুসলিম আলাদা জাতি। এইসব একের পর এক ঘটনা শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ অনুযায়ী স্টাডি করেছিলেন। স্টাডি করে কেন এটা হল— এটা তাঁকে ভাবিয়েছিল। তিনি বুঝলেন, সিপিআইয়ের গোড়াতেই গলদ। এই পার্টি বাস্তবে কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়েই ওঠেনি। তাই তিনি নতুন করে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তুলছেন, তখন ঐক্যবদ্ধ সিপিআই শক্তিশালী পার্টি। তাদের সাপোর্ট করতেন মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে তুং। স্ট্যালিন, মাও সে তুংকে নেতা মেনেও কেন কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি গঠন করতে উদ্যোগী হলেন? তিনি বুঝলেন, সিপিআইয়ের

তিনের পাতায় দেখুন

বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের তলায় চাপা পড়ছে কোটি কোটি গরিব মানুষ

দুয়ের পাতার পর

নেতারা সৎ নিষ্ঠাবান, মার্ক্সবাদে এদের পাণ্ডিত্য আছে— এ কথা ঠিক। কিন্তু পাণ্ডিত্য আর জ্ঞান এক নয়। পাণ্ডিত্য হচ্ছে অনেক বই পড়া, পুঁথিপড়া বিদ্যা। মার্ক্সবাদ পুঁথিপড়া বিদ্যা দিয়ে আয়ত্ত করা যায় না। মার্ক্সবাদকে জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। মার্ক্সবাদ হচ্ছে জীবনদর্শন। মার্ক্স বলেছেন, ইফ ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট চেঞ্জ ইয়োরসেল্ফ। দুনিয়াকে পাল্টাতে হলে আগে নিজেকে পাল্টাও। আমরা সকলেই পুঁজিবাদী সমাজে জন্ম নিয়েছি। প্রত্যেকের টাকার প্রতি লোভ আছে, সম্পত্তির প্রতি লোভ আছে, নাম করার ঝোঁক আছে, পদের মোহ আছে, পারিবারিক দুর্বলতা আছে, স্বার্থপরতা আছে, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তারও প্রভাব আছে। এই চরিত্র নিয়ে মার্ক্সবাদী হওয়া যায় না। ফলে এই সব বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হতে হবে।

মার্ক্সবাদকে ভারতের পরিস্থিতিতে বিশেষীকৃত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

লেনিন বলেছিলেন, একটা ডিক্রি জারি করে, রেজলিউশন পাশ করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা যায় না। তার জন্য একটা আদর্শগত সংগ্রাম দরকার ইউনিটি অফ আইডিয়া অর্জনের জন্য। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ নিয়ে যারা লড়বে তাদের মধ্যে চিন্তার একটা ঐক্য থাকা দরকার। এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে— তা আয়ত্ত করার জন্য একটা সংগ্রাম দরকার। যে কাজটি সিপিআইয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে তাঁরা করেননি। কলকাতা, বম্বে, কানপুর, দিল্লির কয়েক জন ব্যক্তি যাঁরা কমিউনিজম নিয়ে ভাবছেন, তাঁরা হঠাৎ ঠিক করলেন আমরা একটা পার্টি গড়ব কয়েকটা গ্রুপ মিলে। লেনিন এটাও বলেছিলেন, মার্ক্সবাদের জেনারেল লাইন বা সাধারণ নীতি বিশেষ দেশে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ হবে। বলেছিলেন রাশিয়াতে যে ভাবে হবে জার্মানিতে সে ভাবে হবে না, জার্মানিতে যে ভাবে হবে ইংল্যান্ডে সে ভাবে হবে না, ইংল্যান্ডে যে ভাবে হবে ফ্রান্সে সে ভাবে হবে না। ফলে এই শিক্ষা অনুযায়ী ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও বিপ্লবের জেনারেল লাইনকে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ভারতবর্ষের বিশেষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ সংস্কৃতি, এ দেশের বুর্জোয়া চিন্তা, বুর্জোয়া ভাববাদ, এ দেশের হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, এ দেশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি, এই সবকিছুর প্রশ্নেই মার্ক্সবাদের বিশেষ প্রয়োগ কী হবে, যাকে বলা হয় কংক্রিটাইজেশন অফ মার্ক্সইজম ইন এ কংক্রিট সিচুয়েশন অফ এ পার্টিকুলার কান্ট্রি, এইসব নিয়ে সিপিআই নেতারা একদম ভাবেনইনি। লেনিনের এই শিক্ষাকে তারা কোনও গুরুত্বই দেননি। লেনিন এই কাজটা রাশিয়ায় করেছিলেন, মাও সে তুঙ-ও চিনে করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ এটা বুঝেছিলেন। সেই জন্য তিনি তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং সেই ভাবে মার্ক্সবাদকে প্রয়োগ করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি মার্ক্সবাদকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে তিনি বহু অবদান রেখেছেন।

চিন্তানায়ক হিসাবে শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান

দ্বিতীয়ত, কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, **যাঁরা দল গঠন করছেন, তাঁদের মধ্যে মার্ক্সবাদী পদ্ধতিতে আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সকল প্রশ্নে একটা যৌথ সর্বসম্মত চিন্তা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। এই সর্বসম্মত চিন্তা ব্যক্ত হবে যিনি যৌথ চিন্তার অভিব্যক্তিতে সবচেয়ে অগ্রণী, তাঁর মধ্য দিয়ে। তিনিই হচ্ছেন চিন্তানায়ক। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং হচ্ছেন তাই। আমাদের দেশে সিপিআই যেহেতু এই ধরনের আদর্শগত সংগ্রাম করেনি, সেই জন্য এই ধরনের কোনও চিন্তানায়ক তারা গড়ে তুলতে পারেনি। আমাদের দলে এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষের মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে অভ্যুত্থান ঘটেছে। এটা কোনও প্রস্তাব পাশ করে হয়নি। সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এই চিন্তানায়কের অভ্যুত্থান ঘটেছে।** এই প্রক্রিয়াতেই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে ওঠে।

ব্রিগেডে ঃ *সংগ্রামের শপথ*

ব্রিগেডে ঃ *মহান নেতাকে অভিবাদন*

তৃতীয় প্রয়োজন এমন একদল বিপ্লবীর, যারা সত্যিকারের উন্নত মানের কমিউনিস্ট, যারা শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছে তাই নয়, তাদের চিন্তার ক্ষেত্রেও সম্পত্তিভিত্তিক মানসিকতা— অর্থাৎ আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার স্বার্থ, আমার মনে হওয়া, আমার ভাল লাগা, আমি যা মনে করি সেটাই ঠিক, আমার নাম, আমার পদ, আমার রাগ, আমার অভিমান, আমার প্রেম প্রীতি ভালবাসা, অপত্য স্নেহ— এই সমস্ত থেকে মুক্ত। সম্পত্তি না থাকলেও সম্পত্তিভিত্তিক মানসিকতা থাকে। এর থেকেও যারা মুক্ত, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণি ও বিপ্লবের স্বার্থই আমার স্বার্থ, বিপ্লবী দলের স্বার্থই আমার স্বার্থ, এইভাবে যারা একাত্ম হয়ে গেছে— এমন স্তরের লোকেরাই হবে দলের নেতা। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন ধরনের নেতা তৈরি না হচ্ছে, ততক্ষণ বিপ্লবী দল গড়া যায় না। এই তিনটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই (সি) গঠন করেছিলেন।

অন্য দিকে সিপিআই নেতাদের রাজনৈতিক জীবন এবং পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তাঁরা কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কী হবে, জীবনে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ কী ভাবে হবে, এ সব নিয়ে মাথা ঘামাননি। পরবর্তী কালে সিপিএমের ক্ষেত্রেও তাই ছিল। তার ফলে কর্মীদের কমিউনিজমের প্রতি, বামপন্থার প্রতি আবেগ, লড়াইয়ে মার খাওয়া, অনেক পরিশ্রম সত্ত্বেও দলটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারেনি।

ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বর্তমান যুগে, যেখানে ব্যক্তিবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের দল গঠনের তত্ত্বকে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও ডেভেলপ করেছেন, আরও উন্নত করেছেন— তার ভিত্তিতে দল গঠন করেছেন। এই কাজটি সিপিআই নেতারা করেননি। তার ফলে সিপিআই পার্টিটা যথার্থ মার্ক্সবাদী পার্টি নয়, বাস্তবে একটি পেটিবুর্জোয়া সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

শিবদাস ঘোষই ভারতে সর্বহারা বিপ্লবের সঠিক রণনীতি নির্ধারণ করেছেন

'৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, ভারতবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় এসেছে, সে অর্থে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এসেছে। এখানেও সিপিআই-এর সাথে পার্থক্য ঘটল। সিপিআই '৪৭ সালে বুঝতেই পারেনি যে রাজনৈতিক ভাবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। বলেছে— এ স্টেপ ফরওয়ার্ড, এক ধাপ এগিয়েছি আমরা। বলেছে নেহেরু প্রগতিশীল, প্যাটেল প্রতিক্রিয়াশীল। নেহেরুকে সাপোর্ট করতে হবে। সিপিআই-সিপিএমের কোনও কর্মী যদি এখানে থাকেন, তাদের পার্টি কংগ্রেসের দলিলে দেখবেন, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাদের নেতারা বুঝতেই পারেননি যে ভারতবর্ষ বুর্জোয়া অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অন্য দিকে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং এরা শুধু বুর্জোয়া নয়, একচেটিয়া বুর্জোয়া। লেনিন যাকে বলেছেন হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম— ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই স্তরে পৌঁছেছে। এখন তো ভারতীয় বুর্জোয়ারা মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে শিল্পে ও খনিতে। ফলে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, ভারতের বিপ্লবের স্তর হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক। যেখানে ভারতীয় পুঁজিবাদ এই স্তরে পৌঁছেছে সেখানে সিপিএম নেতারা জাতীয় বুর্জোয়াকে প্রগতিশীল গণ্য করে আজও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আউড়ে যাচ্ছেন। যারই পরিণতিতে বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে কখনও তারা কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য করছে, আবার কখনও কংগ্রেসের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে বিজেপির সঙ্গে ঐক্য করেছে। অবিভক্ত সিপিআই ও পরবর্তী কালের সিপিএম সম্পর্কে এই সব আলোচনা করছি কোনও বিদ্বেষ থেকে নয়। এই আলোচনার কারণ, কেন তাদের অ-মার্ক্সবাদী ভূমিকার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষকে আলাদা যথার্থ মার্ক্সবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) গড়ে তুলতে হল, এটা বোঝাবার জন্য।

আর একটা বিষয়ও কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন— 'যে কোনও আদর্শ, যে কোনও দর্শন, যে কোনও বড় মতবাদের মর্মবস্তু নিহিত

চারের পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী বিজেপি-আরএসএস এখন দেশপ্রেম শেখাচ্ছে

তিনের পাতার পর

থাকে তার নৈতিক মান এবং সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে। যেমন প্রাণহীন দেহকে আবর্জনা স্বরূপ ফেলে দিতে হয়, মমতাভরে আটকে রাখলে তা পূতিগন্ধময় অবস্থায় সমাজে মানুষের অকল্যাণ সাধন করে, তেমনই উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতি বর্জিত রাজনৈতিক মতবাদও পরিত্যাজ্য।' **যদি কোনও রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন নৈতিক বলকে জাগাতে না পারে, সাংস্কৃতিক মানকে উঁচু করতে না পারে, তবে মনে রাখবেন সে রাজনীতি অনিষ্টকর এবং তা অকেজো।** এটাও কমরেড ঘোষের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আমাদের দলের বাইরের সাধারণ মানুষ অনেকেই এখানে আছেন। আপনারা আমাদের কর্মীদের প্রশংসা করেন। বলেন, আপনাদের দলটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই আলাদাটা কীসে? একটা হচ্ছে, আমরা ভোটসর্বস্ব পার্টি নই। আমরা বিপ্লবী দল। ভোটের জন্য আমরা যে-কোনও নীতি-আদর্শ বর্জিত সুবিধাবাদের পথে যাই না। আমরা কোনও বড় দলের খোশামোদি করি না। আমাদের দলে উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বিপ্লবী রাজনীতির, বিপ্লবী আদর্শের জীবন্ত চর্চা হয়। আর একটা দিক হচ্ছে, আমাদের কর্মীরা তো এই সমাজেরই ছেলেমেয়ে। কিন্তু এই সমাজের আর দশটা ছেলেমেয়ের থেকে আলাদা কেন? আলাদা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায়। কমরেড শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছেন, আমাদের উন্নত চরিত্র চাই, সংস্কৃতি চাই। তিনি এক সময় দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। সংস্কৃতির যে উচ্চ সুরটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তৈরি হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলি বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি। কিন্তু দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। আজকের দিনে রাজনৈতিক আন্দোলন, গণআন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার, রুচি-সংস্কৃতির উচ্চ মানটা নেমে গেছে। যে উচ্চ মানটা এক সময় এ দেশে গড়ে উঠেছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি। আমরা বড় কথা বলি, কিন্তু বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না।'

আমাদের দলে চরিত্র অর্জনের জন্য জীবন্ত একটা সংগ্রাম থাকে। তাই যাঁরা বলেন, আপনারা অন্যদের থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র— তার বৈশিষ্ট্য এই দুটি জায়গায়। একটা, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা করি, জ্ঞানের চর্চা করি, আমরা চাই কর্মীদের জ্ঞানের মান উন্নত হোক। আর অন্য দিকে তাঁর শিক্ষায় আমরা উন্নত চরিত্র অর্জনের সাধনা করি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, মানুষের মন জয় করবে ভদ্রতা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, শালীনতা দিয়ে। গায়ের জোরে নয়, দাপট দিয়ে নয়, মিথ্যা দিয়ে নয়, কুৎসা দিয়ে নয়। আমরা সেটা রক্ষা করে যাচ্ছি। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী প্রথমে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় চরিত্রগুলি থেকে, বিপ্লবীদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে পরে তার থেকে ছেদ ঘটিয়ে আরও উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছি। এ জন্যই অন্য দল থেকে আমরা স্বতন্ত্র।

নিছক ভোট রাজনীতি নয়, চাই গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম

আমরা ভোটে দাঁড়াই। নির্বাচন যতদিন থাকবে, যতদিন মানুষ তাতে জড়িয়ে যাবে, সেই মানুষগুলোর কাছে আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দাঁড়াই। কিন্তু আমরা কখনও যেনতেনপ্রকারেণ ভোটে জেতার চেষ্টা করি না। হিন্দু ভোট, মুসলিম ভোট, ওই জাতের ভোট, সেই জাতের ভোট, এ সবের চর্চা আমরা করি না। **আমাদের কাছে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলিম নয়, কেউ উচ্চবর্ণ নয়, কেউ নিম্নবর্ণ নয়, কেউ বাঙালি নয়, কেউ বিহারি নয়, কেউ মারাঠি নয়। আমাদের বিচারে ভারতবর্ষে একদিকে শোষিত জনগণ, আর অন্য দিকে শোষক শ্রেণি— এই দুটি শ্রেণি।** এই শোষিত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ নিয়েই আমাদের ভোটের লড়াই। ফলে আমাদের দল সম্পূর্ণ আলাদা। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে জিততে পারি ভাল, না পারলেও আমরা এই নীতি বিসর্জন দেব না। গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে উন্নত নৈতিকতার ভিত্তিতে জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিয়ে বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তুলব।

ফ্যাসিবাদ আজ সকল পুঁজিবাদী দেশেরই বৈশিষ্ট্য, ১৯৪৯ সালেই দেখান শিবদাস ঘোষ

আজ ফ্যাসিবাদের কথা মুখে মুখে। ১৯৪৯ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের এক ঐতিহাসিক উক্তি— বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইটালির পরাজয় হয়েছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়নি। তিনিই প্রথম বলেছেন, উন্নত অনুন্নত সব পুঁজিবাদী দেশেই আজ ফ্যাসিবাদ বিভিন্ন রূপে আছে। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য। একটা হচ্ছে পুঁজির একেন্দ্রীকরণ। মনোপলি ক্যাপিটাল হচ্ছে পুঁজির কেন্দ্রীভূত রূপ। আর একটা হচ্ছে, আগে আইনসভা, প্রশাসন যন্ত্র, বিচার বিভাগের যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ছিল, তাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে সমস্ত ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে কেন্দ্রীভূত করা। আর বলছেন, চিন্তার জগতে অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয় চিন্তা— যেখানে যুক্তি নেই, কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই— এই সবকে উৎসাহ দেওয়া। আর বিজ্ঞানের নামে শুধু যন্ত্র, মেশিন, কারিগরি বিজ্ঞানকে সামনে আনো। অধ্যাত্মবাদের সাথে কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটাও। মানুষের চিন্তাকে মেরে দাও, যুক্তিকে মেরে দাও, বিচারবোধকে মেরে দাও। তা হলে অন্ধের মতো দলকে মানবে, নেতৃত্বকে মানবে, সরকারকে মানবে, রাষ্ট্রকে মানবে— এই জায়গায় নিয়ে যাওয়া। এই ফ্যাসিবাদ যথার্থ মানুষ গড়ার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে। তখন সিপিআই সহ অনেকে তাঁর এই কথাকে বিশ্বাসই করতে চায়নি। এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। ফ্যাসিবাদ কোনও দল আনে না। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের একটা স্তর। পুঁজিবাদের গোড়ার দিকে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র এনেছিল। সেই সময়ে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতির উদগাতা। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিই একচেটিয়া পুঁজির প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে ক্ষয়ের পথে, অবলুপ্তির পথে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। ফলে ফ্যাসিবাদকে জন্ম দিয়েছে পুঁজিবাদ, কোনও বিশেষ দল নয়।

সব সমস্যাকেই শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে

কমরেড ঘোষ বললেন, আজ ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ নতুন স্তরে এসে গেছে, এখন জাতীয় স্বার্থ বলে কোনও কিছু নেই। আগে ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে ধনী-গরিবের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। ইংরেজ চলে গেছে, এখন পুঁজিবাদ ক্ষমতায়। মুনাফার স্বার্থে পুঁজিবাদ চলছে। এখন পুঁজিপতি ও শোষিত শ্রেণির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। ফলে ধনী-গরিবের ঐক্যের প্রশ্ন নেই। এখন একদিকে পুঁজিবাদের শোষণ-লুণ্ঠন আর অন্য দিকে তার বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের শ্রেণি-সংগ্রাম। শোষিত জনগণকে আজ সব কিছুকে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে। ব্যক্তিমাত্রই জেনে হোক, না জেনে হোক, হয় পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করছে, না হলে সচেতনভাবে শোষিত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করছে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

তৃণমূল কংগ্রেস শাসনেও দুর্নীতি-খুন-সন্ত্রাস চলছেই

চারের পাতার পর

রাজনীতিও দুটি— হয় পুঁজিবাদের শোষণকে রক্ষা করার রাজনীতি, আর না হলে পুঁজিবাদী শোষণকে উচ্ছেদ করার রাজনীতি। পুঁজিবাদ থাকবে, শোষিত জনগণও থাকবে— এই অবস্থায় সকলের কল্যাণ করব, এটা মিথ্যাচার। ফলে জাতীয় স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, এ ভাবে বললে হবে না। দেশ এখন বিভক্ত। ফলে সব কিছুকে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হবে।

বিজেপি সরকারের ডবল ইঞ্জিনের তলায় চাপা পড়ছে কোটি কোটি গরিব মানুষ

দেশের আজ যে শোচনীয় পরিস্থিতি আপনারা সকলেই তার ভুক্তভোগী। যখন আমরা আজকের সমাবেশ করছি, সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক— এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে কোনও আশার আলো পাওয়া যায়। ক্রমাগত অন্ধকার আরও গভীর হচ্ছে। এর শেষ কোথায়, সীমা কোথায় তাও সাধারণ মানুষের অজানা। সমস্ত দিকে সর্বাত্মক হতাশা— এরকম একটা অবস্থার মধ্যেই আমাদের এই মিটিং করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন এ দেশের গরিব মানুষের মসিহা, মানে ত্রাণকর্তা। কী রকম ত্রাণকর্তা গরিব মানুষের? গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ১২১টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৭ নম্বরে। ২০২১ সালে ভারতে অনাহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, ঋণ শোধ করতে না পেরে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৩ জন ভারতীয় আত্মহত্যা করেছে। একটা বছরেই এই সংখ্যক আত্মহত্যা! প্রতি দিন সাড়ে চার হাজার শিশু অনাহারে মারা যায়। বাস্তব সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। তিন বছর আগের রিপোর্টে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল, ৯ কোটি ৯০ লক্ষ মধ্যবিত্ত, এখন তা নামতে নামতে ৬ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। মানে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মধ্যবিত্ত এখন গরিবের স্তরে চলে গেছে। বিজেপির বন্ধু শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি প্রতিদিন আয় করে ১৯৭.৮ কোটি টাকা। অন্য দিকে দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার ১৪৬ টাকার কম এবং ৩০ শতাংশ মানুষের রোজগার দৈনিক ৮৩ টাকার কম। গরিবের মসিহা প্রধানমন্ত্রী শিল্পপতিদের ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা ট্যাক্স কনসেশন এবং ঋণ মকুব করে দিয়েছেন। অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ৬০ শতাংশ ঋণ মকুব করে দিতে বলেছে এই বছর। আর ঋণগ্রস্ত সাধারণ গরিব মানুষ দেনার দায়ে আত্মহত্যা করছে। সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধির আগুনেও জ্বলে পুড়ে মরছে। এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের গরিবদের জন্য ত্রাতা নরেন্দ্র মোদির অবদান! তাঁরা বলছেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার। আমরাও বলি, ডবল ইঞ্জিন সরকার। ইঞ্জিন চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁরা ড্রাইভার। ইঞ্জিনের পেছনে গাড়িতে বসে রয়েছে আম্বানি-আদানি-টাটা-বিড়লা-মিত্তাল-জিন্দালরা— ভারতের যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি শুধু নয়, মাল্টিন্যাশনালও। আর গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হচ্ছে ভারতের কোটি কোটি গরিব কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষ। এখানে পাঁচ শতাংশ ধনী লোক ৬০ শতাংশ সম্পদের মালিক। আর নিচু তলার পঞ্চাশ শতাংশ গরিব মানুষ তিন শতাংশ সম্পদের মালিক। ২০২২ সালে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে কত কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে ভেবে দেখুন আপনারা। ভারত সহ বিশ্বের সর্বত্র পুঁজিবাদের আজ তীব্র বাজার সংকট। দেশের অধিকাংশ মানুষই বেকার, অর্ধবেকার কিংবা কর্মচ্যুত। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছেই। তা হলে কিনবে কে? তাই শিল্পের পর শিল্পে লালবাতি জ্বলছে। ওরা স্বীকার করতে চায় না যে, এটা রিসেশন। তাই নতুন শব্দ চালু করেছে 'স্লো ডাউন অফ ইকনমি'।

সামরিক শিল্পের প্রয়োজনেই যুদ্ধ

এই হচ্ছে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট। তাই শিল্পকে কিছুটা চাঙ্গা রাখার জন্য মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রির উপর জোর দিচ্ছে ভারত সহ সব দেশই। এই মিলিটারাইজেশন অফ ইকনমির জন্য প্রয়োজন ওয়ার টেনশন ও লোকাল ওয়ার। লোকাল ওয়ারেও গ্লোবাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্ত হচ্ছে। যেমন ইউক্রেন যুদ্ধে ঘটেছে। ফলে চাকরি হবে কি না, চাকরি পেলেও তা স্থায়ী হবে কি না, সবটাই অনিশ্চিত। প্রথমত আমাদের দেশে স্থায়ী চাকরি উঠে যাচ্ছে, এখন তো কনট্র্যাক্ট সিস্টেম, অস্থায়ী শ্রমিক সমস্ত জায়গায়। এদের কোনও আইনসঙ্গত অধিকার নেই, কোনও স্থায়ী মজুরি ও কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই, যখন তখন ছাঁটাই করে দিতে পারে। এ ছাড়াও মাইগ্র্যান্ট লেবার, গিগ শ্রমিক, আউটসোর্সিং, বন্ডেড লেবার চলছে। দাসপ্রথার যুগ যেন ফিরে এসেছে। অভাবের জ্বালায় বাবা-মা মেয়েকে বিক্রি করে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছে, ২০১৯-২১ এই দু'বছরে ভারতে ১৩ লক্ষের বেশি মহিলা হারিয়ে গেছে। এত লক্ষ মহিলা কোথায় গেল? বিদেশে চালান হয়েছে। এ দেশেও চালান হচ্ছে দেহবিক্রির বাজারে। শিশুদেরও বিক্রি করে দিচ্ছে। এ দেশে কয়েক কোটি শিশুশ্রমিক।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আরএসএস

কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছে বিজেপি, যে বিজেপি দাবি করে তারা জাতীয়তাবাদের প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক, দেশাত্মবোধের প্রতীক। বাস্তবটা কী? এই বিজেপিকে গড়ে তুলেছে যারা, সেই আরএসএসের ইতিহাস কী, তা অনেকেই হয়তো জানেন না। যখন আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলন চলছে, তখন আরএসএসের নেতা গোলওয়ালকর বলছেন, 'দেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তা যথার্থ স্বাধীনতা আন্দোলন নয়। এই স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল। বলছেন, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং সার্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে আমাদের জাতিত্বের ধারণা তৈরি হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত হিন্দু জাতিতত্ত্বের সদর্থক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের উপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে। ... তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক যারা তাদের অন্তরে হিন্দুজাতির গৌরব পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দুজাতির স্বার্থহানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু।' এই হচ্ছে গোলওয়ালকরের বক্তব্য।

যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে শহিদরা আত্মদান করছেন, সুভাষচন্দ্ররা লড়ছেন, সেই সময় গোলওয়ালকররা বলছেন, যারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ছে তারা প্রতিক্রিয়াশীল, তারা দেশের শত্রু, তারা বিশ্বাসঘাতক। তা হলে গোলওয়ালকরের বিচারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই, সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, এঁরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক, দেশের শত্রু। তাদের যুক্তি থেকে এটাই দাঁড়িয়ে যায়। সেই জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা কোনও ভূমিকাই নেয়নি। আজ তারাই নিজেদের 'দেশপ্রেমিক' বলে দাবি করছে। এটা কি আপনারা মেনে নেবেন?

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীরা এখন দেশপ্রেম শেখাচ্ছে

ওরা সাভারকরকে বলছে বীর সাভারকর। নেতাজির পাশে স্থান দিচ্ছে। এই বীর সাভারকরের বক্তব্য আছে আমাদের কাছে। সাভারকর যখন

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘ইন্ডিয়া’ জোট কোন ভারতের প্রতিনিধি

পাঁচের পাতার পর

আন্দামানে বন্দি ছিলেন তখন তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনবার মার্সি পিটিশন দায়ের করেছিলেন। বলেছিলেন, আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিলে ব্রিটিশ সরকার যা করতে বলবে আমি তাই করব। বলেছিলেন, আমার কথায় যারা দেশের কাজে এসেছিল আমি তাদের সকলকে বোঝাতে পারব এবং তারা ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে কাজ করবে। অথচ এ দেশের ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা সহ অসংখ্য শহিদ হাসিমুখে মাথা উঁচু করে ফাঁসিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন, প্রাণভিক্ষা চাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন চলছে, তখন ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন সাভারকর। দেশ ভাগের দাবিও তুলেছিলেন। ফলে যে বিজেপি-আরএসএসের এই ভূমিকা— তারা এখন দেশবাসীকে দেশপ্রেম বোঝাচ্ছে, তারা এখন জাতীয়তাবাদের স্লোগান তুলছে! দেশের মানুষকে তাদের এই চরিত্র বুঝতে হবে।

আমি আরও বলতে চাই যে, বিজেপি বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ করে দিচ্ছে, ডারউইনকে পাঠ্যবই থেকে বাদ দিচ্ছে। বেদ-বেদান্ত, মনুসংহিতা এগুলিকে উৎসাহিত করছে। আর ভারতীয় নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন বলছেন, সংস্কৃত শিক্ষা ও বেদান্ত সমাজকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি বলছেন, ইউরোপ থেকে বিজ্ঞান চাই, পলিটিকাল ইকনমি চাই। আর নবজাগরণের মহান চরিত্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিজ্ঞাননির্ভর বস্তুবাদী যুক্তিভিত্তিক দর্শন চাই। শিক্ষক হবেন তাঁরাই, যাঁরা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ও ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত। এমনকি বিবেকানন্দও বলেছিলেন, ইউরোপ থেকে আমাদের বিজ্ঞানকে নিতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, “ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকের মতবাদ কী আমরা জানি। আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদদের কী রূপ ক্ষতি করিয়াছে। এক একটি নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাহাদের গৃহে একটি একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে। আর সেইজন্যই তাহারা সকল যুগেই এই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে।” বিবেকানন্দের এই উক্তি সম্পর্কে বিজেপি-আরএসএস নেতারা কী বলবেন? তাঁরা তো বেদ-বেদান্ত, গীতা, মনুসংহিতাতেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন এবং সম্ভবত, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী চন্দ্রে অভিযান করেছেন বলেও দাবি করবেন!

কে যথার্থ হিন্দু— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, না আরএসএস-বিজেপি

বিবেকানন্দ বলছেন, রামায়ণের কথা যদি ধরেন, তবে রাম বলে কেউ ছিল এটা মানতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। রামায়ণ থেকে শিক্ষা নেওয়ার যদি দরকার থাকে সেই শিক্ষা নিতে হবে। তিনি বলেছিলেন, “আমার একটি সন্তান থাকলে তার কাছে যা সত্য মনে হবে সে তারই শিষ্য হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।” এই বিবেকানন্দকে কি আরএসএস-বিজেপি নেতারা হিন্দু বলে গণ্য করবেন? বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, “কোনও ধর্মই কখনও মানুষের উপর অত্যাচার করেনি। ... কোনও ধর্মই এই অন্যায় কাজকে সমর্থন করেনি। তবে মানুষকে এই সব কাজে উত্তেজিত করল কীসে? রাজনীতিই মানুষকে এইসব অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছে, ধর্ম নয়”। বিবেকানন্দের এই বিচারে আজকের ভারতে আরএসএস-বিজেপির স্থান কোথায়? তাঁরা কি রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোতে ধর্মকে ব্যবহার করছেন না? ফলে বিজেপি-আরএসএস নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী এবং যথার্থ হিন্দু ধর্মেরও বিরোধী। রামকৃষ্ণ কি মুসলিম আর খ্রিস্টানদের দালাল ছিলেন যে, মসজিদে নামাজ পড়েছেন, গির্জাতে প্রার্থনা করেছেন? বলেছেন, ভগবান-আল্লা-গড এক, যেমন পানি-জল-ওয়াটার এক। তা হলে কে যথার্থ হিন্দু— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ না আরএসএস-বিজেপি?

বিজেপি রামমন্দির তৈরি করছে শুধুমাত্র

ব্রিগেডে ঃ মহিলারা এসেছেন সারা দেশ থেকে

আগামী ভোটের জন্য। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে, বিজেপি-আরএসএসের বৈঠক হয়েছে। আরএসএস পশ্চিমবাংলার বিজেপি নেতাদের পরামর্শ দিয়েছে যে আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে তোমরা এ বারে ভাল করে রামনবমী করো, দুর্গাপূজা করো। এই হচ্ছে তাদের ধর্মভক্তি। আসল হল ভোটভক্তি।

‘ইন্ডিয়া’ জোট কোন ভারতের প্রতিনিধি

সম্প্রতি বিরোধী দলগুলি ‘ইন্ডিয়া’ বলে একটা জোট গঠন করেছে। এই ‘ইন্ডিয়া’ কোন ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে? এই ইন্ডিয়া কি অত্যাচারিত শোষিত গরিব মানুষের ইন্ডিয়া, নাকি আম্বানি আদানি টাটা বিড়লার ইন্ডিয়া? এই জোটে রয়েছে কংগ্রেস। সেই তো প্রথম দেশে পুঁজিবাদকে শক্ত করেছে, ফ্যাসিবাদের ভিতকে শক্ত করেছে। সেই কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ও সেকুলার বানাচ্ছে সিপিএম। কংগ্রেস আমলে দাঙ্গা হয়নি? ভাগলপুরে, রাউরকেলায়, আসামের নেলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দিল্লিতে শিখ নিধন দাঙ্গা কংগ্রেসই করেছে। এই কংগ্রেস সেকুলার? যে সমস্ত অগণতান্ত্রিক আইন আছে— টাডা, মিসা, আন ল-ফুল অ্যাক্টিভিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট, আফস্পা— সবই তো কংগ্রেস এনেছে। সেগুলিকেই বিজেপি আরও কঠোর করছে। এই কংগ্রেস গণতান্ত্রিক? ’৫৯ সালের ৩১ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য শহিদের রক্ত ঝরিয়েছে কারা? ঐক্যবদ্ধ সিপিআইয়ের শহিদ স্তম্ভ আছে বউবাজার মোড়ে চারজন মহিলার নামে। সেই কংগ্রেসকে সিপিএম গণতান্ত্রিক লেবেল দিচ্ছে, সেকুলার বলে জাহির করছে!

আঞ্চলিক দলগুলিও গণতান্ত্রিক নয়

আঞ্চলিক দলগুলিরও কেউ কি গণতান্ত্রিক? গণআন্দোলন দমনে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধে তার তার রাজ্যে সবাই তো ফ্যাসিস্টিক। যারাই গদিতে বসে পুঁজিবাদের সেবা করবে তারাই ফ্যাসিস্টিক হতে বাধ্য। আর কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে সরকারে যারা আছে সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। একটা কথা মনে রাখবেন, আজ ভারতের বড় বড় বুর্জোয়া পার্টি, আঞ্চলিক বুর্জোয়া পার্টি, সকলেরই নীতি হচ্ছে দুর্নীতি। প্রত্যেকেই দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আবার প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে অপরকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে। বাস্তবে দুর্নীতিতে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। যেমন আম্বানি আদানি টাটা বিড়লা সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য শোষণ করব, কোটি কোটি টাকা লুটব। এই পার্টিগুলিরও একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এমএলএ-এমপি হব, মন্ত্রীত্বের গদিতে বসব, আর টাকা লুটব। এ যেন পাবলিক মানি আত্মসাৎ করার কম্পিটিশন চলছে! যেন, তুমি যখন পাবলিক মানি আত্মসাৎ করছ, আমি করব না কেন? এ যেন একটা অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাবলিকও যেন অনেকটা মেনে নিয়েছে— গদিতে বসলে সবাই খায়, এ নিয়ে বলার কী আছে! এই চিন্তা বিপজ্জনক। সমগ্র পুঁজিবাদই দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই জাতীয় ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। পাবলিককেও তারা দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। আর ক্রিমিনালাইজেশন অব পলিটিক্স নয়, বাস্তবে ‘ক্রিমিনালাইজেশন বাই দি পলিটিশিয়ান’ই হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস শাসনেও খুন-দুর্নীতি-সন্ত্রাস চলছেই

এই ইন্ডিয়ার মধ্যে তৃণমূলও সামিল— যে তৃণমূল পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় বসেই ঘোষণা করেছিল, বদলা নয় বদল চাই। কী বদল করেছে? এ তো সিপিএমের ৩৪ বছর শাসনের কার্বন কপি। সিন্ডিকেট, কনট্রাক্টর, প্রোমোটারদের রাজত্ব চলছে। তোলাবাজি, কাটমানি অব্যাহত। চলছে চরম দুর্নীতি। ভোটের নামে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল পশ্চিমবাংলায়। থানা-পুলিশ-প্রশাসন সবই দলীয় কন্ট্রোলে চলে। পার্থক্য হচ্ছে, সিপিএম করত সংগঠিত আর সূক্ষ্মভাবে, আর এদের সব ঢিলেঢালা, খোলামেলা। এরাও গণআন্দোলনের কণ্ঠরোধ করছে। সরকারি কর্মচারীরা কোনও প্রতিবাদ করতে পারবে না। অন্য কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। এই সরকারের আমলেই আন্দোলনে পুলিশের লাঠির আঘাতে আমাদের দুই কর্মীর চোখ নষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি কুলতলিতে আমাদের দলের নেতৃস্থানীয় কমরেড সুধাংশু জানাকে গলা টিপে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা বলে প্রচার করেছে। প্রথমে পুলিশ প্রশাসনের রিপোর্টে খুন বললেও, শাসক দলের নির্দেশে পরে তা বদল করেছে।

লোককে ঠকাবার জন্য, ভোট পাওয়ার জন্য কেন্দ্র যেমন আয়ুষ্মান ভারত, স্বচ্ছ ভারত, আবাস নির্মাণের কাজ ইত্যাদি করে, এ রাজ্যেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ক্লাবে অনুদান সবটাই তো ভোটের জন্য হচ্ছে। বেকারত্ব দূর করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ— এ সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে মানুষকে দান-খয়রাতি করছে। এগুলি হচ্ছে আগেকার দিনে যেমন জমিদাররা সারা বছর প্রজাদের রক্ত নিংড়ে শোষণ করত, তারপর বছরে এক-দু’বার কাঙালিভোজন করাতো, তেমনই গরিব মানুষকে এক কেজি চাল, পাঁচশো টাকা, দুর্গাপূজার জন্য পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকা— এ হচ্ছে বেকার যুবকদের কিনে নেওয়া। ভোটের সময় পশ্চিমবাংলায় রক্ত ঝরেছে, কংগ্রেস ও সিপিএমের আমলেও ঝরেছে। ওই সময় বেশি রক্ত ঝরেছে, না এই সময় বেশি রক্ত ঝরেছে, ওই সময় বেশি খুন হয়েছে, কি এই সময় বেশি খুন হয়েছে— এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, খুন হবে কেন? রক্ত ঝরবে কেন? বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, দাঙ্গা বাধানো চলছে ভোটের প্রস্তুতি হিসাবে। একই কারণে মণিপুরেও আগুন জ্বলছে। হরিয়ানায় দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। সিপিএম পশ্চিমবাংলায় আয় বাড়ানোর অজুহাতে মদের দোকান চালু করেছিল। তৃণমূল তাকে ছাড়িয়ে আরও বেশি মদের দোকান চালু করল।

১৯৭৭ সালে সিপিএমকে রিগিং করতে হয়নি। তখন জনগণ কংগ্রেস-বিরোধী মানসিকতা থেকে ভোট দিয়েছিল। তারপর সিপিএম যখন জনগণের আস্থা হারায় তখনই বুথ দখল, রিগিংয়ের পথে যায়। ২০০৯ সালে, ২০১১ সালে সিপিএমবিরোধী মানসিকতা থেকে জনগণ দু’হাতে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। তখন তাকে বুথ দখল করতে হয়নি, রিগিং করতে হয়নি। আজ তাকে করতে হচ্ছে। কারণ তারা জনগণের আস্থা হারিয়েছে।

ভোটে পুঁজিপতিদের তোলা হাওয়ায় জনগণ ভেসে যায়

নির্বাচন তো একটা প্রহসন। নির্বাচনে বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের পছন্দের দলগুলির পিছনে টাকা ঢালে। আর বুর্জোয়া শ্রেণি সংবাদমাধ্যমগুলোকে, খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেলগুলোকে কাজে লাগায়। হাওয়া তোলে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, মানুষের মধ্যে যদি রাজনৈতিক চেতনা না থাকে,

সাতের পাতায় দেখুন

সিপিএম বামপন্থাকে কলুষিত করেছে

ছয়ের পাতার পর

সংঘশক্তি না থাকে, মানুষ যদি সঠিক বিপ্লবী দল না বোঝে, মানুষ সেই হাওয়ায় ভেসে যায়। আর একটা কথা তো এক অংশের মানুষের মধ্যে এসেই গেছে। ভোটে কিছু টাকা পাব। পাঁচটা ভোটের দাম পাঁচ হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা। পঞ্চাশটা ভোট হলে এক লক্ষ টাকা। একটা গরিব পরিবার এক লক্ষ টাকা পাচ্ছে। ফলে টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। এটাই গণতান্ত্রিক নির্বাচন! ভোটের সময় এটাই হয়। এই টাকা কোথা থেকে আসে? পুঁজিপতি, বড় ব্যবসাদার, কালো টাকার কারবারিদের থেকে, আর সরকারি ফান্ড থেকে। তারা ভোটে যে টাকা ঢালে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, ট্যাক্স বাড়িয়ে সুদে আসলে বহুগুণ আদায় করে নেয়। এখন বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল পাঠ্যবইয়ে আছে। বাস্তবে চলছে বাই দ্য ক্যাপিটালিস্ট, ফর দ্য ক্যাপিটালিস্ট, অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট। মানি পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার ও মাসল পাওয়ারই ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করে। লোকে আমাদের বলে, আপনারা পাগল। আপনারা ভোটও চান, টাকাও চান। আমরা বলি, হ্যাঁ আমরা পাগলই। এরকম পাগল হয়েই যেন থাকতে পারি। কারণ আমরা মালিকদের টাকায় চলি না। পুঁজিপতিদের টাকায় চলি না। আপনাদের আর্থিক সাহায্যেই চলি। আর পাবলিককে ঠকাতেও চাই না।

সিপিএম বামপন্থাকে কলুষিত করেছে

ফলে রাজনীতি দুটি। একটা পুঁজিবাদকে রক্ষা করার রাজনীতি, আর একটা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার রাজনীতি। এইসব বুর্জোয়া পার্টি— বিজেপি, কংগ্রেস, আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল— এদের রাজনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদকে রক্ষার রাজনীতি। আর এস ইউ সি আই (সি) -র রাজনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি। এখন সিপিএমও বামপন্থী আন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে পুঁজিবাদ রক্ষার রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে শুধু সিট পাওয়ার জন্যে। সিপিএমের বর্তমান দুর্দশা আগে ছিল না। ঐক্যবদ্ধ সিপিআই একসময় পার্লামেন্টে সর্ববৃহৎ বিরোধী দল ছিল। ১৯৫২ সালে এই কলকাতায় সিপিআই বেশিরভাগ আসনে জিতেছিল। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সিপিআই সিপিএম মিলিট্যান্ট গণআন্দোলনে ছিল। ১৯৬৭ সালে সরকারি গদিতে বসার পর থেকে তাদের পরিবর্তন হতে থাকে। তারা গণআন্দোলনের রাস্তা পরিত্যাগ করতে থাকে। তারপর সিপিএম ৩৪ বছর শাসন করেছে। এই **৩৪ বছরের শাসনে তার তো শক্তি বাড়ার কথা! তাহলে শক্তি ক্ষয় হল কেন? কেন এখনও তৃণমূল বিরোধী জনগণ সিপিএমকে বিকল্প ভাবছে না? কেন আজ তাদের কংগ্রেসের হাত এবং এক পীরের হাত ছাড়া চলে না? সিপিএম কর্মীরা ভেবে দেখুন, দলের নেতৃত্ব দলকে কোথায় নামিয়ে এনেছে! তারা ৩৪ বছর পুঁজিপতিদের স্বার্থে গণআন্দোলন দমন করেছে। সর্বত্র একচ্ছত্র দলীয় আধিপত্য কায়েম করেছে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করেছে, দলীয় স্বার্থে অ্যান্টিসোসালদের ব্যবহার করেছে— এ ভাবে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে।** যার ফলে ব্রিটিশ আমল থেকে কংগ্রেস শাসন পর্যন্ত বামপন্থার ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণপন্থীরা শক্তিশালী হল, বিজেপি মাথা তুলতে পারল। ১৯৬৯ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। আর শুধু মাথা তোলা নয়, গত লোকসভা ভোটে আমরা শুনেছি, সর্বত্র একই কথা— 'এখন রাম, পরে বাম'। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট নির্দেশ দিয়েছিল কি না, আমরা জানি না। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র এটা চলেছে। এই সুবিধাবাদ কে শিখিয়েছে? সৎ সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা ভেবে দেখুন, ভোটসর্বস্ব রাজনীতির স্বার্থে ট্যাকটিক্সের দোহাই দিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব আজ কোথায় নামেছে!

ব্রিগেডে ঃ মেডিকেল ক্যাম্পে তৎপর চিকিৎসক-কর্মীরা

ধর্মের জোয়ার যত বাড়ছে, নৈতিক অধঃপতনও তত বাড়ছে

এই পুঁজিবাদ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে। বিবেককে ধ্বংস করছে। চরিত্রকে হত্যা করছে। পারিবারিক জীবনে স্নেহ-মমতা, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক ভালবাসা-বিশ্বাস সব কিছু ধ্বংস করছে। মদ, গাঁজা, ড্রাগ অ্যাডিকশন বাড়ছেই। আরেকটা অ্যাডিকশন— সেক্স অ্যাডিকশন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দিন যৌনতা নিয়ে মত্ত থাকো। নোংরা ছবি দেখো, নোংরা বই পড়ো, সেই চিন্তাভাবনায় থাকো। নারীদেহ দেখলেই নোংরামি করো, ইতরামি করো। আর একটা হল কনজিউমার গুডস অ্যাডিকশন। অর্থাৎ পকেটে টাকা না থাকুক, একটা মোবাইল চাই। ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, রাস্তায় বেরোলে একটু চকচকে জামা বা শাড়ি চাই। গ্রামে গরিবদের মধ্যেও চলে গেছে

আটের পাতায় দেখুন

বিশিষ্টদের চোখে ব্রিগেড সমাবেশ

পথের দাবি

ভরা ব্রিগেড। লাল শালু আর পতাকায় মোড়া সুউচ্চ সুবিশাল মঞ্চের বাঁ পাশে যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে কৌণিক দৃষ্টিতে দেখা ত্রিমাত্রিক পশ্চাদপট একটা ভিন্ন অবয়ব ধারণ করেছে, যেন মুষ্টিবদ্ধ হাতের ক'টা আঙুল। অদ্ভুত সমাপতনে উল্টোদিকে, মঞ্চের ডান পাশে খোলা আকাশের প্রেক্ষাপট জুড়ে ৬৫টি তলা নিয়ে আকাশ আঁচড়ানো অট্টালিকার দানবীয় উপস্থিতি। তারই পাদদেশ ঘিরে, সামনে পিছনে পথে পথে বিস্তৃত ময়দান ছাপিয়ে কল্লোলিত জনস্রোত— যার উৎপত্তি বহু বছর আগে জয়নগরের এক ছোট্ট সভাস্থলে। আকাশে উড়ে উড়ে কটা উড়ুক্কু যান দেখলাম যন্ত্রচক্ষুতে মাপছে সেই ক্রমশ স্ফীতকায় স্রোতের আড়-বহর। যন্ত্র-চক্ষুর তোলা আলোকচিত্র কি ধরতে পারবে জনস্রোতের মেজাজ বা ভাবনার রূপ? মঞ্চের সামনে হাজার লোকের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আলাদা করে দেখতে পারছিলাম না সেই 'কুলতলির পার্টিতে' আজ হাজির কর্ণাটকের গ্রাম নগর থেকে আসা চিকিৎসকদের, অথবা দিল্লি এইমসের স্নাতকোত্তর বা কটক মেডিক্যাল কলেজের তরুণ ছাত্রদের।

না তারা আসেননি কোনও বিশেষ দাবি নিয়ে, পড়ার বাড়তি সুযোগ বা চাকরির আর্জি নিয়ে। যেমন আসেননি গঙ্গাপাড়ের জুটমিল শ্রমিক, বর্ধমানের খেতমজুর বা ঝাড়খণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষক আলাদা আলাদা ঝান্ডা বা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝলে একটু অবাকই লাগে। কোনও আশু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নয় বা নির্বাচনী প্রচার নয়— এত লোক, দূর গ্রাম থেকে আসা প্রান্তিক চাষি থেকে চারপাশের মহতী সব অট্টালিকা থেকে নেমে আসা সরকারি বেসরকারি চাকুরেরা ভিড় করেছেন শুধু একজন চিন্তানায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁর চিন্তার আলোয় তাঁদের চারপাশের দুনিয়াকে নতুন করে চিনতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তর, দেশভাগ সব মিলিয়ে বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের ঝোড়ো সময়ে রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে সামনের পথ চেনা সহজ ছিল না, বিশেষ করে অনুশীলন, যুগান্তরের মতো বিপ্লবী গোষ্ঠীর বা নানা গুপ্ত সমিতির সদস্যদের। জেলে থাকতে মার্ক্সবাদ পড়ে তাঁদের অনেকেরই ভাবনায় নতুন চিন্তার প্রসার কী ভাবে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশ স্বাধীন হবার পরও মানুষের কল্যাণে এক কল্যাণকামী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য আবার এক নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে, সে ইতিহাস বহুকথিত। নানা ভাবে, নানা ব্যাখ্যায়।

সভামঞ্চ ঘিরে বিশাল কিন্তু সুশৃঙ্খল জনতাকে দেখছি সাগ্রহে শুনছেন মাইকে প্রভাস ঘোষের গলায় সে ইতিহাসের টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ। খাবার নেই, থাকার জায়গা নেই, পরবার কাপড় নেই, একটাই ভাল জামা পালা করে পরা, কিন্তু খামতি নেই নিরন্তর অধ্যয়নে, বিশ্রাম নেই সঠিক পথের সন্ধানে নতুন নতুন পথে পদচারণায়। সঠিক পথ কী? সহযাত্রীদের মধ্যেই অনেক তর্ক-বিতর্ক। সশস্ত্র সহিংস বিপ্লব না রাজনৈতিক পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিপতি-বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষাকারী শাসকদের হাত থেকে শ্রমিক-কৃষকের বন্ধু সমাজতন্ত্রীদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতার বদল? সংসদীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা কী বা কতটা? সে রাস্তা খুঁজতে শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ছিল পথ চলতে চলতেই পথ চেনা। এক বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি 'পথের দাবী'কে নিয়ে শরৎচন্দ্রের ওই একই নামের উপন্যাস আর তার নায়ক সব্যসাচী মল্লিক তাই ছিল তাঁর বড় প্রিয়। অনুজ সহযাত্রীদের জন্য লেখায় বক্তৃতায় সব্যসাচীর উক্তি, "পথের দাবীর ভালমন্দ দিয়েই আমার সত্যাসত্য নির্ধারিত হয়, এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি"। বারবার উদ্ধৃত করে শিবদাস ঘোষ সেই সহজ শিক্ষাটাই দিতে চেয়েছিলেন।

এত বছর পরেও, এত লোক তাই দেখতে পাচ্ছি পথে নেমে এসে স্মরণ করছেন এমন একজন লোকের কথা যিনি বলতে পারতেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। দীর্ঘ সময় ধরে খুঁটিয়ে দেখছেন তাঁর আর সহযাত্রীদের চলার পথের নানা বাঁক, নানা ক্রান্তিকারী মুহূর্তের সাক্ষ্য বহনকারী লেখা-চিত্রের প্রদর্শনী। স্মৃতি ভারাক্রান্ত বয়স্ক অনেকের চোখে জল, আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে তরুণদের মনেও। ভিড়ের মধ্যে সম্ভবত এমন অনেক প্রাজ্ঞ সচেতন ব্যক্তিত্বরা, রাজনীতিক বা অরাজনীতিক আছেন, যাঁরা অন্য মতের পথিক হয়েও এসেছেন শুধু একজন সৎ ভাল মানুষের শ্রদ্ধায় অবনতমস্তক হতে। আজকের মাত্রাছাড়া সহিংস দলাদলির আর দুর্নীতির আবহে সেটা সম্ভবত এক বড় পাওনা। পথের দাবিও হয়তো।

ডাঃ অরুণাভ সেনগুপ্ত
বিশিষ্ট ক্যানসার সার্জেন

প্রত্যয়ই নীরবে সরব

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি নিভৃতে কাজ করে। ৫ আগস্টের ব্রিগেড সমাবেশই তার সাক্ষ্য বহন করে। প্রত্যয়ই নীরবে সরব। স্বউচ্চারের আস্ফালন নেই। আছে মনোযোগ— আছে বিশ্বাস— দৃঢ় প্রত্যয়। এই বিশ্বাসই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির জীবনীশক্তি।

গণেশ হালুই
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

অসামান্য বিশ্লেষণী

নিজে একটি জীবনচর্যা যাপন করে বক্তব্য রাখলে সেই বক্তব্য যে হৃদয়গ্রাহী হয় প্রভাসবাবুর সে দিনের বক্তব্য তার প্রমাণ। যদিও আমার কাছে বক্তব্যের প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট অসামান্য রকম বিশ্লেষণী লেগেছে, জনসভায় উপস্থিত ক'জন সঠিক ভাবে সেটি অনুধাবন করতে পেরেছেন, জানি না।

ডাঃ দাশগুপ্ত

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

এসইউসিআই(সি) পার্টি জনগণের, একে বড় করার দায়িত্ব জনগণেরই

সাতের পাতার পর

এই ভোগবাদের প্রভাব। এইসব অ্যাডিকশন পুঁজিবাদ নিয়ে এসেছে। কারণ যুবকদের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করতে না পারলে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই যে ধর্ষণ হচ্ছে— প্রতিদিন কাগজ খুললেই পাবেন ধর্ষণের খবর। তিন বছরের শিশু, ছ'মাসের শিশুকন্যা ধর্ষিত হচ্ছে। আশি-নব্বই বছরের বৃদ্ধা ধর্ষিত হচ্ছে! বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে! গত ২৮ জুলাই কাগজে বেরিয়েছে, আলিপুর কোর্টে মামলা চলছে, ছেলে মাকে ধর্ষণ করেছে। কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! কোথায় বাস করছি আমরা! এ তো পশুজগতেও ঘটে না! এটা ঘটছে কী করে? ধর্মের জোয়ার যত বাড়ছে— ততই ধর্ষণের সংখ্যাও বাড়ছে। পুঁজিবাদ সভ্যতাকে কোন নরকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে! দেশের যে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে পারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, নজরুলরা, দেশবন্ধু, তিলক, লালা লাজপত, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং-রা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি।

ফলে জনগণের মূল শত্রু পুঁজিবাদ। লড়াই হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দল একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লবের ঝান্ডা নিয়ে। আমাদের লক্ষ্য পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আমরা বলতে চাই, বিজেপি যদি ভোটে হারে, সেটা ভাল। তার ঔদ্ধত্য, উগ্র হিন্দুত্ব, ডোন্ট কেয়ার ভাব খানিকটা কমবে। কিন্তু 'ইন্ডিয়া' জোট জিতলেও সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে, তা নয়। এর শরিকরা কেউ সেকুলার নয়। সেকুলার কথার অর্থ হচ্ছে, আমাদের ভাষায় বলছি না, নেতাজির ভাষায় বলছি— 'রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। রাজনীতি পরিচালিত হবে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যুক্তির দ্বারা।' শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও উন্নত রূপে বলেছেন, সেকুলার মানে পার্থিব। এ জগৎই সত্য। তাকে ভিত্তি করে সেকুলার হিউম্যানিজম।

সেই হিসাবে এরা কেউ সেকুলার নয়। এরা কেউ গণতান্ত্রিকও নয়। এদেরও সব আম্বানি, আদানি, টাটা— সকলের সাথে গাঁটছড়া। বিজেপিকে যদি শিল্পপতিরা ১০০ টাকা দেয়, ওদের অন্তত ৩০ টাকা, ৪০ টাকা দেয় ইলেকশন বন্ডে। এরা কেন্দ্রীয় সরকারি গদিতে বসলে দেশের মূল সব সমস্যাই অটুট থাকবে। কারণ **এদের সকলেরই বুর্জোয়া পলিটিক্স, বুর্জোয়া রুল। এর বিকল্প হচ্ছে প্রোলেটারিয়ান পলিটিক্স, প্রোলেটারিয়ান রুল। তাই সর্বহারা অলটারনেটিভ চাই, সর্বহারা বিকল্প চাই। তার জন্য প্রথম চাই সংগ্রামী গণআন্দোলন, শ্রেণিসংগ্রাম। এর জন্যই আমরা বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ জোট চাই। তারা আন্দোলনে আসুক। নিছক কিছু সিট পাওয়ার লোভে এর সাথে, তার সাথে ঐক্য নয়, ঐক্য চাই গণআন্দোলনের স্বার্থে, শ্রেণি সংগ্রামের স্বার্থে।** যদি সিপিএম গণআন্দোলনে থাকত তা হলে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়া যেত। আমরা সাধ্যমতো একক ভাবে চেষ্টা করেছি। কংগ্রেসের সাথে যাবে বলে, সংগ্রামী আন্দোলন চায় না বলে, তারা আমাদের সাথে ৬ পার্টির বাম ঐক্য ভেঙে দিল, এমনকি আমাদের না জানিয়েই। সিপিএম কর্মীরা একবার ভাবুন, কত বড় সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।

ব্রিগেডে ঃ মগ্ন শ্রোতারা

নিজেদের স্বার্থেই গরিব মানুষকে রাজনীতি বুঝতে হবে

আর বলব, এ দেশে কিছু হবে না— এমন সব চিন্তায় জনগণের কোনও লাভ নেই, বরং ক্ষতি আছে। তাতে শুধু হতাশাই বাড়বে। এই সংকট আরও বাড়তে থাকবে। সব দলই সমান, মুখে ভাল ভাল কথা বলে, আসলে সবাই সমান— এ কথা বললে আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। আমরা সেই দলে নেই। আমরা লোক ঠকাই না, মিথ্যা কথা বলি না। আমরা সুনির্দিষ্ট নীতি-আদর্শ নিয়ে চলি। জনগণকে বলব, রাজনীতি বুঝুন। প্রত্যেকবার ভোটে এইসব নেতারা এই করব, সেই করব, নানা রঙিন প্রতিশ্রুতি দেয়। লোকভোলানো বুলি আওড়ায়। কাগজে প্রচার হয়। টিভিতে রেডিওতে প্রচার হয়। আপনারাও হাওয়ায় ভেসে যান। নেতারা ঠকায়, এ কথা ঠিক। কিন্তু আপনারাও ঠকছেন কেন? আমরাও যদি ঠকাতে চাই, আপনারা ঠকবেন কেন? আপনারা চোখ খোলা রাখুন। রাজনীতি বুঝুন। আমরা ঘরসংসার করি, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, সাতে-পাঁচে থাকি না, অত রাজনীতি আমাদের পোষায় না— এই সব কথা বললে বারবার ঠকবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ঠকেছেন। রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে টাটা-বিড়লার ঘরের ছেলেমেয়েরা নয়— সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। অথচ ক্ষমতা দখল করল পুঁজিপতি শ্রেণি। সেদিন মানুষ বুঝতে চায়নি গান্ধীজি ঠিক, নাকি সুভাষচন্দ্র ঠিক। তখনও জনগণ বলত, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী করব? অতশত বুঝি না। আর গান্ধীজি তো অবতার, সন্ন্যাসীর মতো, এরকম ভাব ছিল। ফল যা হওয়ার হয়েছে। আজও যদি একই জিনিস চলে, রাজনীতি বুঝি না, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তা হলে বার বার ঠকবেন। রাজনীতি আপনার ঘরে। আপনার হাঁড়ি চড়বে কি না, কড়াইতে তেল ঢালতে পারবেন কি না, ঘরে বাতি জ্বলবে কি না, ছেলেমেয়ের পড়া হবে কি না, চিকিৎসা হবে কি না, চাকরি হবে কি না, হলে থাকবে কি না, খাবার জুটবে কি না— সবটাই তো রাজনীতি ঠিক করছে। আপনি তো রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। আপনি একটা দলকে ভোট দিচ্ছেন, তাকে জিততে সাহায্য করছেন— এটাও তো রাজনীতি। অথচ রাজনীতি ভাববেন না, এটা চলে না। মাথা দিতে হবে, ভাবতে হবে। পড়তে হবে। না হলে বার বার ঠকবেন। এক দল যাবে, আরেক দল আসবে। ওকে দেখেছি, তো এবার একে দেখি। একে দেখেছি, তো এবার ওকে দেখি— এই চলতে থাকবে। গোলকধাঁধায় ঘুরবেন।

১৫ আগস্ট আসছে। সেই দিন এই নেতারা ভাষণ দেবেন। দেশের কত উন্নয়ন করেছেন, তার ফিরিস্তি দেবেন। এই রাজভবন, দিল্লির প্রেসিডেন্টের ভবন, প্রধানমন্ত্রীর ভবন আলোকমালায় সজ্জিত হবে। তোপধ্বনি হবে। আর বহু তারকাখচিত হোটেলে বিরাট ভোজ হবে। আবার তাদের নিক্ষিপ্ত যে উচ্ছিষ্ট ডাস্টবিনে পড়বে, সেগুলো কুড়োবে আমাদের দেশের ফুটপাথের ছেলেমেয়েরা। নিত্যদিনের মতো ওই দিনও রাতের অন্ধকারে অসহনীয় দারিদ্রপীড়িত মা-বোনেরা দেহবিক্রির বাজারে পণ্য হয়ে দাঁড়াবে। পুঁজিবাদ-সৃষ্ট এই নিষ্ঠুর শোষণ, ভয়াবহ দারিদ্র, বেকারত্বের যন্ত্রণা, মূল্যবৃদ্ধির আগুন, মনুষ্যত্বের ধ্বংস, ধর্ষণ-গণধর্ষণ, মন্ত্রিত্বের গদিলোভী নেতাদের নির্লজ্জ দুর্নীতি ও ভণ্ডামি— এ সব আপনারা চলতে দেবেন, বাড়তে দেবেন, না কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি নেবেন? এটা আপনাদেরই ঠিক করতে হবে।

এই পার্টিটা আপনাদের, একে বড় করার দায়িত্ব আপনাদেরই

ফলে কমরেডস ও বন্ধুগণ, এই পার্টিটা এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। এই দল গড়ার ইতিহাস প্রমাণ করেছে মার্ক্সবাদের শক্তি কত অপরাজেয়। কমরেড শিবদাস ঘোষকে কে সৃষ্টি করেছে? মার্ক্সবাদই সৃষ্টি করেছে। আবার কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই মার্ক্সবাদকে আরও উন্নত করেছেন। এই মার্ক্সবাদকে বুঝতে হবে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারাকে বুঝতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। যাতে তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে উপযুক্ত বিপ্লবী হিসাবে আমরা গড়ে উঠতে পারি, যাতে সর্বহারার মহান নেতা, মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে আরও শক্তিশালী করতে পারি, গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামকে জোরদার করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে পারি। আপনারা যারা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন, প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা করে যান যে এই দলকে আরও শক্তিশালী করবেন। আপনারা এসেছেন প্রবল আবেগ নিয়ে। যাঁরা বয়স্ক, আপনাদের বলব, আপনাদের ঘরের একটি দুটি ছেলেমেয়েকে আমাদের হাতে তুলে দিন। তারা হয়ত গুলিতে মরবে, ফাঁসিতে প্রাণ দেবে, কিন্তু মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে মনুষ্যত্বের ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। বাকিদের, ছাত্র-যুবদের বলব ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে এগিয়ে আসুন দলে দলে। আর অন্যদের বলব, 'আপনারা বড় হোন', শুধু এই আকাঙ্ক্ষাই এই দলটার প্রতি ব্যক্ত করলে হবে না— আমাদের বড় হতে সাহায্য করুন। আপনারা সক্রিয় সহযোগিতা করুন। আপনারা ঘরে বাইরে সর্বত্র আমাদের বক্তব্য নিয়ে যান। আমাদের পক্ষে দাঁড়ান। আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই।

পরিশেষে আর একটি কথা বলব। আপনাদের সকলের দায়িত্ব এই পার্টিটাকে রক্ষা করা। আমাদের কোনও কর্মীর ভুলত্রুটি দেখলে আপনারা গার্জিয়ান হিসাবে তাদের সমালোচনা করবেন, শাসন করবেন, সাহায্য করবেন। এটা আপনাদের দায়িত্ব। এই দলটা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দল। কিন্তু এই দলটা আপনাদের, এ দেশের গরিব মানুষের, এ দেশের শোষিত জনগণের। এই দলটাই আপনাদের বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার। এ দলটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com